৩. সর্বভারতীয় মোঘল সাম্রাজ্য গঠনে আকবরের রাজপুত নীতি কিভাবে সহায়তা করেছিল ?

ভূমিকাঃ-রাস্তববাদী ও দূরদর্শী বিচক্ষণ শাসক আকবর সিংহাসনে বসে অল্প দিনের মধ্যে বুঝে গিয়েছিলেন, যে রাজপুতদের সাথে সংঘর্মের পরিবর্তে সুসম্পর্কের নীতি গ্রহণ করলে লাভের সম্ভবনা অনেক বেশী। স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক রাজপুত জাতির সাথে মুঘলদের প্রীতির সম্পারটি স্থাপিত হলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত শক্ত হবেও সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বাড়বে। তাই আকবর রাজপুতদের সাথে বন্ধুত্ব হোক বা বৈবাহিক সূত্রে হোক একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্যদিয়ে পরোক্ষভাবে নিজের প্রভূত্ব ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। জনৈক ঐতিহাসিক আবারের রাজপুত নীতি সম্পর্কে যতার্থই বলেছেন Rajput should first be subdued and then conciliated .

আকবরের রাজপুতনীতির কারনঃ- দূরদর্শী আকবর "সমস্ত দমনমূলক ও বৈষম্যমূলক পুরানো নীতি পরিত্যাগ করে রাজপুত ও হিন্দু দের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করেন। এর পিছনে কিছু গভীর কারণ ছিল।

১। ভারতের রাজপুত, হিন্দুরা সংক্ষা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়। তাই এদের সহযোগিতা ছাড়া মোঘল সাম্রাজ্যের অস্থিত্ব টিকবে না। তাই রাজপুতদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল আপোসধর্মী ও বন্ধুত্বপূর্ণ।

২। ভারতের মুঘলরা আগুণ্ডুক ছিলেন তাই তাদের প্রধান ও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ভারতের আফগান শক্তি। শেরশাহের পর আফগান শক্তি দূর্বল হয়ে পড়লেও বাংলা, বিহার, মালব প্রভৃতি স্থানে আফগানদের প্রাধান্য ছিল। আফগানদের দমন করতে সেই পরিস্থিতিতে রাজপুত শক্তিরা সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

৩। মুঘল অভিজাতদের বিশ্বস্ততা নিয়ে আকবরের সন্দেহ ছিল। কারণ, বৈরাম খাঁ, শাহ আবদুল খাঁ মালি, আদম খাঁ, আবদুল্লা খাঁ উজবেগ, আত্মীয় মীর্জা প্রমুখ একসময়ে আকবরের প্রতি অনুগত হলেও পরে আনুগত্য বিসর্জন দিয়ে তারা বিদ্রোহ করেছিল। সেইজন্য তিনি রাজপুত শক্তির উপর নির্ভর করেছিলেন। ঐতিহাসিক ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ সুন্দরভাবে বলেছেন there could be no Indian Empire with out The Rajputs, No political or Social Synthesis without their Intelligent and active co-operation ।

আকবরের রাজপুতনীতির বৈশিষ্টঃ

রাজপুতদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল আপসধর্মী ও বন্ধুত্বপূর্ণ। তাঁর রাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট ছিল তিনি উদ্বৃত্ত শান্ত। আপোসমূলক ও প্রভূত্বমূলক ব্যবহারের সমন্বয় সাধন করতে পারতেন। তিনি সাধারণভাবে আপস ও মৈত্রীর মাধ্যমে রাজপুতদের জয়করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ওই উপায় ব্যর্থ শক্তি প্রয়োগ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। রাজপুত রাজারা পরাজয়ের পর যদি বশ্যতাং স্বীকার করতেন তাহলে তিনি তাঁদের প্রতি উদার ব্যবহার করতেন এবং তিনি তাঁদের স্ব স্ব-রাজ্যে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ভৌগ করার অধিকার দান করতেন। তিনি রাজপুত রাজাদের সাম্রাজ্যশাসনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতেন এবং ক্ষমতা অনুসারে তাঁদের প্রশা সনের উচ্চতম পদেও নিয়োগ করতেন। প্রকৃত পক্ষে আকবরের সাম্রাজ্য ছিল মুঘল শক্তি ও কুণ্ঠনীতির সাথে রাজপুত শৌর্য ও সেবার মিশ্রনের ফলশ্রুতি।

বৈবাহিক সম্পর্কের নীতিঃ তাঁর রাজপুত নীতির রূপায়নের প্রথম ধাপই ছিল রাজপুতদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন। তিনি রাজপুতদের সাথে বিবাহ সম্বন্ধের মাধ্যমে মৈত্রী প্রতি করতে সবদাই উৎসহত ছিলেন। এই জাতীয় সম্বন্ধ প্রথম স্থাপিত হয় 1562 খ্রীষ্টাব্দে যখন অম্বরের রাজা রানা ভারমল তাঁকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করেন। এই রাজপুত রমণী ছিলেন সবরাজ সেলিমের (জাহাদীর) গর্ভ ধারিনী। অম্বরের উদাহরণে উৎসাহিত হয়ে বিজ্ঞানীর, জয় শলমীর, মারবার প্রভৃতি রাজপুত রাজ্যগুলিও ঐ একই পথ অনুসরণ করতে থাকল। বিবাহের মাধ্যমে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ বেনীপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন যে ' The marriage alliance, symbolised. The dawn of new era in Indian polities, It gave the country a line of remarkable sovereigns; it secured four generations of Mughal Emperor's them Service of the greatest captains and diplomats That medieval India produced .'

ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ বলেছেন যে এই ব্যবস্থায় একটা সামন্জস্য ও সদিচার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়ে ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রাজপুত দের সাথে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে আকবর তাঁদের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ধ্বংস করতে চেয়েছিলেনকিন্তু এই বক্তব্য যথার্থ নয়। ভারতের ইতিহাসে এই ধরনের বিবাহ অজানা ছিল না বলে কিংবা অন্যায্য বিবেচিত হত না।

উচ্চপদে নিয়োগঃ

আকবরের সামরিক বাহিনীতে অর্ধেকের বেশী সেনা রাজপুত ও হিন্দুদের মধ্য থেকে নিয়োগ করতেন। উচ্চদায়িত্বশালী সরকারী পদে রাজপুতদেরই নিয়োগ করতেন। রাজা ভগবান দাস রাজা মানসিংহকে সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ করেন। অন্যান্য রাজপুত ও হিন্দুদের মধ্যে রাজা তোডরমল ও রাজা বীরবল উচ্চ লাভ করেছিলেন।

ধর্মীয় সহিত তার নীতিঃ

আকবর বাজপুত ও হিন্দুদের পূর্ণধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেছিলেন। তিনি রাজপুত ও হিন্দুদের নতুন মন্দির নির্মাণ, পুরানো মন্দির সংস্কারও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান, মূর্তী পূজা ইত্যাদিকে স্বাধীনভাবে সম্পাদনের অনুমতি দেন। রাজনৈতিক অভিযানের সময় কোন মূর্তী বা মন্দির তিনি ধ্বংস করেননি। আকবর সশরীরে হিন্দুদের বহুধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। যেমন হোলিং দেওয়ালী, দশেরা ইত্যাদি।

জিজিয়া ও অন্যান্য তীর্থঙ্কর বিলোপের নীতিঃ

1562 শ্রী আকবর জিজিয়া কর বা অমুসলমানদের প্রদের কর তুলে দেন। 156ও স্ত্রী রাজপুত ও হিন্দুদের উপর থেকে সমস্ত প্রকার দমনমূলক কর ও তীর্থকর তুলে দেন। এই ভাবে রাজস্ব ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে রাজপুত ও হিন্দুদের কৃতজ্ঞতাভাজনে পরিণত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক লেনপুলের মতে রাজস্ব সংস্কারের মত এত জন প্রিয় ব্যবস্থা এর আগে কেউ গ্রহণ করেন নি।

সমাজ সংস্কারের নীতিঃ

আকবর মানবতাবাদী সংস্কারক হিসাবে হিন্দু সমাজে সতীদাহ ও বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বিধবাদের পূর্ণবিবাহের উৎসাহ দিয়েছিলেন।

সহিষ্ণু মনোভাবের আরো একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্তঃ

রাজপুতদের প্রতি আকবরের সহিষ্ণু মনোভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত হল বুন্দির রাজা সুরজন হাজার এর সাথে সম্পাদিত এক চুক্তি। এই চুক্তিতে আকবর যেসব শর্তগুলি উল্লেখ করেছিলেন তা হল –

১। জিজিয়া কর বহিত ২। বুন্দিরাজ মুসলমান হারেমে কন্যা পাঠাতে বাধ্য থাকবে না। ৩। রাজপুতদের নিজ রাজ্যসীমার বাহিরে পাঠান হবেনা। ৪। নওরোজ উৎসবে মীনবাজারে তাঁদের পরিচিত মহিলাদের পসরা নিয়ে বসতে বাধ্য করা হবে না। ৫। দেওয়ানী-ই-আমে রাজপুতদের সশস্ত্র অবস্থায় প্রবেশাধিকার দেওয়া ৬। হিন্দু মন্দিরের মর্যাদা রক্ষা ৭। রাজপুত্র অশ্বারোহীদের চিহ্নিত করণ প্রথা বন্ধ করা ইত্যাদি।

আক্রমণাত্মক নীতিঃ-

অধিকাংশ রাজপুত শক্তি যেমন যোধপুর, জয়পুর, বিকার্নির, জয়সলমীর, বুঁদি প্রভৃতির শাসকরা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেও মৈবার রণাম্বোর, কালিঞ্জর রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁকে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করতে হয়।

রাজপুতনার অধিকাংশ খণ্ডরাজ্যগুলি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেও মেবার আকবরের সাথে বন্ধুত্বকে আত্ম অবমানমার প্রতীক বলে মনে করত। সুতরাং সেবারের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ ভিন্ন আকবরের কাছে অন্যকোন বিকল্প ছিল না। যদিও আকবর ও মেবারের সৎকর্মের পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। 1567 খ্রীস্টাব্দে মেবার আক্রান্ত হল। অপদার্থ রাজা রানা উদংসিং রাজধানী পরিত্যাগ করে পাহাড়ে পালিয়ে গেলেন। চিতরের পতনের পর রনম্বোর, কলির, জয়শলমীর এবং বিজ্ঞানীরের রাজপুত রানারা এক্কের একাম্বেশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু উদয় সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রতাপসিংহ মোঘল হানাদারদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকলেন। তিনি অতিসামান্য শক্তি নিয়ে বিশাল ও সুগোঠিত মুঘল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুখোমুখী হলেন। 1576-খ্রিষ্টাব্দে হলদি আটের যুদ্ধে তিনি মোঝেলদের দ্বারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হন। রাজস্থানে হয়তো রানা প্রতাপের চেয়ে যোগ্যতর সেনাপতি এবং আরো তীক্ষ্ন কুটনীতিজ্ঞ দেখা গেছে। কিন্তু প্রতাপের চেয়ে সাহসী এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মহান নেতা আর কখনও দেখা যায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র অমরসিংহ এই কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যান।

উপসংহারঃ

আকবরের রাজপুত নীতি ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের ওপর এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল। রাজপুতদের প্রতি সাথে ব্যবহারই ভারতে হিন্দু-মোসলিম সংস্কৃতির মিলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। - এই নীতি দুই সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছিল। তাঁর রাজপুত্র নীতির ফলে যে রাজপুতারা আফগান সুলতান দের বিরুদ্ধে 350 বৎসরেরও অধিকাল ধরে ক্রমা গত সংগ্রাম চালিয়ে এসেছিলেন তাঁরাই মুসল সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়। আকবরের রাজপুত নীতির গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা ওরাঙ্গজেবের শাসনের অন্ধকার দিনগুলিতে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কারণ ঐ সময়ে আকবরের মৈত্রী নীতি পরিত্যক্ত হয় ও সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যা মোঘেল সাম্রাজ্যের পতন তরান্বিত করে।

৪. ইরফান হাবিবের গবেষণার বিশেষ উল্লেখসহ মুঘল যুগের কৃষি সঙ্কট সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

উত্তর - মুঘল সরকারের রাজস্বের প্রধান আয় ভূমি রাজস্ব থেকে আদায় হতো| গৌতম ভদ্র এর ভাষায়, "কৃষকরা ছিল মুঘল যুগের শাসক শ্রেণীর বিপুল ঐশ্বর্যের উৎস"| আবার ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন, মুঘল সাম্রাজ্য একটি সমঝোতার উপর দাঁড় করানো ছিল| কৃষকের হাতে জীবন

ধারণের মতো কর্মস্থান সম্রাট রাখতেন| তার বাড়তি উৎপাদন সাধ্যমত সংগ্রহ করতেন| মুঘল সাম্রাজ্যের সব অঞ্চলে সমান হারে রাজস্ব আদায় করা হতো না, তবে অধিকাংশ অঞ্চলে উৎপাদনের অর্ধেক রাজস্ব হিসাবে দাবি করা হতো|

মোরল্যান্ড জানিয়েছেন যে, মুঘল যুগের শেষে কৃষকদের উপর রাষ্ট্রের দাবি বৃদ্ধি পেয়েছিল| ভূমি রাজস্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নানা ধরনের "আব ও ওয়ার বা বেআইনি কর"| মুকুন্দ রামের চন্ডীমঙ্গলে এইসব বেআইনি করের বিস্তারিত বিবরণ আছে| এইসব কর কৃষকদের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠেছিল|

মুঘল আমলের কৃষিজমি মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল, যেমন-

1. **খালিসা জমি**
2. **জায়গির জমি**

যে জমি থেকে সম্রাটের নিজস্ব আয় আসতো তাকে বলা হতো, খালিসা জমি| আর নগদ বেতনের পরিবর্তে যে জমি মনসবদারদের(আরো পড়ুন) ভোগ দখলের স্বত্ত্বে দেওয়া হতো, তাকে জায়গির জমি বলা হতো| যারা জায়গির অধিকারী হতেন তাদের জায়গিরদার বলা হতো| এই জায়গিরের উপর জায়গিরদারদের কোন ব্যক্তিগত মালিকানা থাকতো না| জায়গিরদারদের জায়গির চ্যুত করা বা অন্য জায়গায় বদলি করা ছিল সম্রাটের ইচ্ছাধীন|

অষ্টাদশ শতকে মনসবদারদের সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জায়গির অভাব দেখা দিতে থাকে| অধ্যাপক গৌতম ভদ্র বলেছেন যে, "আগে যে জায়গির এক মনসবদারদের পক্ষে যথেষ্ঠ ছিল, তা পরবর্তীকালে একাধিক মনসবদারদেরকে দেওয়া শুরু হয়েছিল"| কাফি খান লিখেছেন যে, "খাতা কলমে পাওয়া মনসবদারদের উপযুক্ত জায়গির পেতে একজন শিশু বৃদ্ধ হয়ে যেত"|

এর ফলে একদিকে যেমন জায়গিরহীন মনসবদার সৃষ্টি হতে থাকে, অন্যদিকে অসংখ্য মনসবদারদের মধ্যে সীমিত পরিমাণ উৎকৃষ্ট জায়গিরের(আরো পড়ুন) জন্য রেষারেষি এক নজিরবিহীন সংকটের সৃষ্টি করে| এই সংকটের কথা বারংবার উল্লেখ পাওয়া যায় সমসাময়িক দলিলে| আওরঙ্গজেব আক্ষেপ করে বলেছেন, "এক আনার সদ বিমার অর্থাৎ একটি বেদনা ও একশত অসুস্থ লোক"|সমসাময়িক লেখক এনায়েত উল্লা লিখেছেন, "সম্রাটের সম্মুখে উচ্চ পদস্থ লোকদের মিছিল অফুরন্ত, কিন্তু জায়গিরের জন্য নির্দিষ্ট জমি সীমিত"| জায়গির না পাওয়ার জন্য মনসবদারদের শোচনীয় অবস্থার কথা ভিনসেন্ট ও কাফি খান স্পষ্ট জানিয়েছেন|

শাসক শ্রেণীর এই সংকটকালীন অবস্থায় ইরানি, তুরানি ও হিন্দুস্তানিদের মধ্যে সর্বোচ্চ সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়| এর ফলে শাসক শ্রেণীর মধ্যে দলাদলি বৃদ্ধি পাই| সব দলই চাইতেন "ওয়াজির বা মির বক্সীর মতো" গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করে শাসনতন্ত্রকে নিজেদের আয়ত্তে আনতে|উদ্বৃত্ত সম্পদের স্বীয় ভাগ পাওয়ার জন্য শাসক শ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৃষকদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল| ইরফান হাবিব ও গৌতম ভদ্র দেখিয়েছেন যে, এই চাপের ফলে কৃষকরা তাদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান থেকে বঞ্চিত হতেন| জায়গিরদারদের জায়গির দাবিতে কোন স্বত্ত্ব না থাকার ফলে তাদের বদলির হার বাড়তে থাকে| স্বাভাবিকভাবেই জায়গিরদাররা নিজেদের অঞ্চলে কৃষি কাজ সম্পর্কে খুব আগ্রহী ছিলেন না|এর ফলে জায়গিরদাররা বিভিন্ন চাপ সৃষ্টি করে কৃষকদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার কর আদায় করতেন| বার্নিয়ে, মানুচি, সাদি খান, ভিনসেন্ট স্মিথ, কাফি খান এরা প্রত্যেকেই কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন|জমিদাররা(আরো পড়ুন) প্রায় তাদের জায়গির থেকে নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করতে পারতেন না বলে এই আদায় দায়িত্ব অন্য এক দলের হাতে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতেন, তাদেরকে বলা হতো ইজারাদার| মূলত তাকেই ইজারা দেওয়া হতো যিনি সব থেকে বেশি রাজস্ব সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিতে পারতেন|অধ্যাপক গৌতম ভদ্র এর মতে, এইভাবে কৃষকদের উপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, তাদের কাছে বাঁচার পথ ছিল চাষবাস ত্যাগ করে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া|

কৃষকদের দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের শুধু ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহ| অনেক ক্ষেত্রে কৃষক সমাজের ক্ষোভ ও অসন্তোষকে সংগঠিত করে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জমিদাররা| কেননা জমিদাররাই প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং তাদের বিভিন্ন অধিকার ও দায়িত্ব ইজারাদাররা আত্মসাৎ করেছিল| এইভাবে বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ মুঘল সমাজের সংহতি ও শক্তির মূলে আঘাত করেছিলো|

এইভাবে মুঘল আমলে শেষ পর্বে সমাজের কৃষি ব্যবসায় এক ব্যাপকভাবে সংকটের সৃষ্টি করেছিল| জমি অনাবাদী হওয়ায় ভূমি রাজস্ব থেকে সরকারের আয় কমতে থাকে| মুঘল আমলে কৃষি সংকট এবং এর পরিণামে সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহে|পরিশেষে ইরফান হাবিব বলেছেন, আওরঙ্গজেবের উত্তরসূরিদের আমলে এই সমস্যার তীব্রতা আরও বেড়ে ছিল এবং ক্রমশ তা সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছিল|

৫. ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য / মারাঠা নীতি আলোচনা করুন| মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য এটি কতটা দায়ী ছিল?

উত্তর - সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দীর্ঘ 50 বছর ব্যাপী রাজত্বের অর্ধেক কাল কেটেছিল দাক্ষিণাত্যে। দাক্ষিণাত্যে তখন সমস্যা ছিল না, তা নয়। তবে ঐ সব সমস্যা মেটানোর জন্য সম্রাটকে দাক্ষিণাত্যে যেতে হয়নি। রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে নানা কারণেই সম্রাট দাক্ষিণাত্যের প্রতিবেশীকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়েছিলেন।

দাক্ষিণাত্য অভিযানের কারণঃ শাহাজাহানের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা থাকাকালীন ঔরঙ্গজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুটি জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দারা ও জাহান্নার বিরোধীতা নয় বরং নিজ পিতার হস্তক্ষেপে তা সম্ভব হয়নি। 1658 খ্রীঃ নিজে সিংহাসনে বসার পর দক্ষিণ ভারতে নজর দেয়ার মত বিশেষ সময় পাননি। এরমালে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুটি মোঘল সাম্রাজ্যবাদী নীতির হাত থেকে রক্ষা পায়।1681 খ্রীঃ এক ভিন্নতর পরিস্থিতিতে তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই রাজ্যদুটি জয়ের পশ্চাতে বিভিন্ন কারণের কথা বলা হয়।

(i) বলা হয় যে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এই রাজ্যদুটির স্বাধীন অস্তিত্ব সুন্নী ঔরঙ্গজেবের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

(ii) দাক্ষিণাত্যের এই রাজ্য দুটি মোঘলদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের নানাভাবে সাহায্য করত এবং চুক্তি অনুযায়ী তারা মোঘল বাদশাহকে উপেক্ষা করে পারস্যের সম্রাট এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত।

(iii) এই সময় নানা কারণে সাম্রাজ্যের বার্ষিক আয়ু কমে গিয়েছিল। প্রদর্শীক শাসনকর্তাদের অনেকেরই মৃত্যু হয়েছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা অনেকেই রাজস্ব বন্ধ করেছিল। এই অবস্থায় বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিপুল ধনভাণ্ডার ঔরঙ্গজেবকে প্রলুব্ধ করেছিল।

বিজাপুর :

মারাঠা ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের সাহায্য নিয়ে বিজাপুর সুলতান আদিলশাহ মোঘল বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যান। বিজাপুর অভিমান পরিচালনার জন্য 1685 খ্রীঃ মে মাসে ঔরঙ্গজেব শোলাপুরে উপস্থিত হন এবং একটি ফরমাণে বিজাপুর সুলতানকে মোঘলদের বশ্যতা স্বীকারে বিজাপুরের মধ্য দিয়ে মোঘল, সেনার যাতাযাতে র সুযোগদান এবং মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে ৫/৬ হাজার অশ্বারোহী সেনা দিয়ে মোঘলদের সাহায্য করার দাবী জানানো হয়। বিজাপুর সুলতান এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেন এবং মোঘলরা বিজাপুরে যেসকল স্থান দখল করেছিল সেগুলি প্রতাপনের দাবী জানানো হয়। যাই হোক দীঘ ১৮ মাস অবরাধের পর 1686 খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বরে দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি কারণে বিজাপুর আত্মসমপনে বাধ্য হয় এবং বিজাপুর মোঘল সাম্রাজের অন্তভুক্ত হয়।

গোলকুণ্ডা জয়ঃ

এরপর ঔরঙ্গজেব সমৃদ্ধ গোলকুণ্ডার দিকে নজর দেন। মারাঠা ও বিজাপুরের সঙ্গে যোগাযাগ-এবং মদন্না এবং অকন্না নামে দুই ব্রাহ্মণকে মন্ত্রীত্বে নিয়োগ বাদশাহকে যথেষ্ঠ ক্ষুধ করে। তিনি বিধর্মী মন্ত্রীদয়কে অপসারিত করার দাবী জানালে কুতুবশাহি সুলতান আবুল হাসান তা প্রত্যাখ্যান করেন। এই অবস্থায় ঔরঙ্গজেব গোলকুন্ডা দুর্গ অবরোধ করেন এবং আবদুল্লা পানি নামে জনৈক আফগান দুর্গরক্ষীর বিশ্বাসঘাতকতায় 1687 খ্রি 21 শে ফেব্রুয়ারি মোঘোল বাহিনী দুর্গ দখল করেন। গোলকুণ্ডা মোঘল সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মারাঠা নীতি:

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের পর ঔরঙ্গজেব পূর্ণ শক্তিতে মারাঠাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ঔরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁর উপর শিবাজীকে দমনের দায়িত্ব অপন করেন।প্রাথমিক কিছু সাফল্যের পর লাঞ্ছিত শায়েস্তা খাঁ ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে দমনের জন্য সুদক্ষ সেনাপতি জয়সিংহ ও দলির খাঁকে পাঠান। জয়সিংহের উদ্দেশ্য ছিল শিবাজীকে মোঘলদের মিত্রে পরিণত করা। তাই জয়সিংহ-এক দিকে শিবাজীর কাছে মিত্রতার প্রস্তাব দেন এবং অপর দিকে কুটনীতির মাধ্যমে তাকে মিত্রহীন করার চেষ্টা করতে থাকেন। শিবাজীর 'অনুগত বহু জায়গীরদার মোঘোল পক্ষে যোগদান করেন। শেষ পর্যন্ত শিবাজী 1665 খ্রী: জুন মাসে পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য হন। সন্ধির শর্তগুলো হলো–১। মোঘল সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন ২। 23টি দুর্গ ও কয়েকটি জেলা মোঘলদের ছেড়ে দেন। সন্ধি সম্পাদনের কিছু দিন পরেই জয়সিংহের অনুরোধে শিবাজী পূত্র সমুজীসই আগ্রায় যান। কিন্তু ঔরঙ্গজের শিবাজীকে আগ্রার দুর্গে নজরবন্দী করে রাখেন। সুচতুর শিবাজী শিশুসহ সেখান থেকে পলায়ন করে নিজরাজ্যে ফিরে আসেন। তাকে কোনভাবেই পরাজীত করা সম্ভব নয় দেখে ঔরঙ্গ জেব তাকে রাজা বলে স্বীকার করেন। কিন্তু 1670 খ্রীঃ থেকে শিবাজী মোঘলদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করেন। পুরন্দরের সন্ধির শর্ত হিসাবে সে 23 টি দূর্গ তিনি মোঝোলদের ছেড়ে দিয়েছিলেন সেগুলি তিনি একে একে পুনরুদ্ধার করেন।1674 শ্রী ছত্রপতি শিবাজী রামগড় দূর্গে মহা সমারোহে তিনি অভিষেক সম্পন্ন করেন।

শিবাজীর মৃত্যুর পর তার পুত্র শম্ভুজী মারাটা রাজ্যের সিংহাসনে বুঝেন। 1689 শ্রী তিনি মোঝোল বাহিনীর হাতে বন্দিহন। এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। শম্ভুজীর মৃত্যুর পর রাজারামের নেতৃত্বে মারাঠারা মোঘলদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী মোঘলদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে থাকেন। দষ্টি দুই দশক ধরে মুদ্ধ চালিয়ে ওরঙ্গজেব মারাঠামের বিরুদ্ধে কোন সাফল্য অর্জন করতে পারলেন না। অবশেষে যুদ্ধবিধ্বস্তও রীস্ত হয়ে 1707 শ্রীস্টাব্দে আহম্মদনগরে পরলোকগমন করেন।

দাক্ষিণাত্ব নীতির সমালোচনা। মারাঠানীতির সমালোচনা। দাক্ষিণাত্ব নীতির ব্যর্থতার কারণ। মারাঠা নীতি ব্যর্থতা কারণ

1) ঔরাঙ্গজেব দাক্ষিণাত্বে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত রাজ্য ও মারাঠাদের দমন করার জন্য দুইদশক ধরে ব্যস্ত থাকেন। উত্তর ভারতে তাঁর অনুপস্থিতি জনিত কারণে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

2) উত্তর ভারতে বিশৃঙ্খল পরিস্হিতির সুজোগ নিয়ে মোঘল অভিজাতরা মমতা বৃদ্ধি করে। দরবারী রাজনীতিতে আহতুক হস্তক্ষেপ্ত করে।

3) সাম্রাজ্যে অভিজাত বিদ্রোহ ও কৃষকবিদ্রোহ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাতে পরিণত হয়।

(4) ঔরাঙ্গজেব দাক্ষিণাত্বে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্তরাজ্য ও মারাঠাদের দমন করতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যায় করেন যার ফলে মোঘল কোষাগারে আটতি পড়ে।

5)মোঘল সৈনবাহিনী দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধে ব্যাপীত থাকার মোঝোল সৈনবাহিনী বলান্ত হয়ে পড়ে। সৈনবাহিনীর রননিপুনতা ও দক্ষতা হ্রাস পায়।

6) ওরাঙ্গজেব বিজাপুর, গোলকুণ্ডাকে দমন করেন। অথচত্রই দুটিরাজ্য স্বাধীন থাকলে এরাই দাক্ষিণাত্বে ঔরাঙ্গজেব 'মারাঠাদের অগ্রগতি রোধকরত। কিন্তু এই দুই রাজ্যের বিলুপ্তির ফলে মোগোলবাহিনীকে মারাঠেদের দমন করতে গিয়ে বেগ পেতে হয়। তাছাড়া এই দুটি রাজ্যের বিলুপ্তীর ফলে এদের কর্মচ্যুত সৈনগণ মারাঠা বাহিনীতে যোগদান করে, ফলে মারাঠা শক্তি বৃদ্ধি করে।

7) জয়সিংহের পরামর্শ মত ঔরাঙ্গজের যদি শিবাজীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দিতেন তাহলে শিবাজী মোরখোল বিরোধীতার পথ ত্যাগ করতেন। ঔরাঙ্গজেবকে বিজাপুর ও গোলকুন্ডার বিরুদ্ধে নামতে হতো না।

8) শম্ভুজীকে প্রানদন্ত দিয়ে ঔরঙ্গজের মারাত্ব ভুল করেন।ঐতিহাসিক স্মিথ ও এলফিনস্টোনের মতে ওঁরাগজেব দাক্ষিণাত্রে সুলতানী রাজ্যগুলি জয় করে অদুরদর্শীতার পরিচয় দেন। কিন্তু যদুনাথ সরকার ও সতীশচন্দ্র এই মতের বিরোধীতাকরেণ তাঁরা বলেন দাক্ষিণাত্মে সুলতানী রাজ্যগুলি জয়েরণীতি আকবর প্রথম গ্রহণ করেন, ঔরাঙ্গজেব নয়। দাক্ষিণাত্বে ক্ষয়িষ্ণু ও দুর্বল সুলতানী রাজ্য দুটির পক্ষে নবজাগ্রত মারাঠা রাজ্যকে পরাস্ত করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না।

৬. মুঘল যুগে ভারতের সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পকে টিকা লেখ।

মুঘল যুগে যেসব ইউরোপীয় পর্যটক ও বনিক ভারতে এসেছিলেন তাঁদের বিবরণী থেকে মুঘল যুগের সামাজিক জীবনের একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়।

সামাজিক শ্রেণীবিভাগ :

মুঘল সমাজ মানুষ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এই সামন্ত সমাজে প্রধান তিনটি শ্রেণীর মানুষ ছিল -বাদশাহ ও আমীর-ওমরাহ, বিভিন্ন কারিগর ও ব্যবসায়ী শ্রেনী এবং শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়। সামাজিক বৈষম্যময় পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন বিলাস বৈভব তেমনি অন্যদিকে দরিদ্র মানুষের চাপা কান্না ছিল।

পর্যটকদের চোখে সমাজচিত্রঃ

সমাজে সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদার আসনে আসীন ছিলেন সম্রাট বা বাদশাহ আকবরের আমলে ইংরাজ পর্যটক রালফ ফিচ ফতেপুর সিক্রি ও আগ্রার অনুপম সৌন্দর্য ও অতুল ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। জাহাঙ্গি রের রাজত্বকালে উইলিয়াম হকিন্স, ফ্রান্সিসকো ও স্যার টমাস রো ভারতে এসে রাজদরবারের আড়ম্বর ও সম্রাটের বিলাসিতার চিত্রটি তুলে ধরেছিলেন। ফরাসী পর্যটক তাভার্নিয়ের, বার্নিয়ের ও ইতালীয় পর্যটক মানুচি শাহজাহানের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন। এঁদের বিরন থেকে জানা যায় সম্রাট ও তাঁর আমীর ওমরাহ প্রত্যেকেই অতিরিক্ত বিলাসিতা ও আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে দিন কাটাত।

জনগণের জীবনযাত্রাঃ

বিশাল মুঘল সমাজে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ ছিল শ্রমিক, কৃষক,কারিগর, সাধারণ মানুষ। বিদেশী পর্যটকরা বলেছেন, সাধারণ মানুষ সহজ সরল ও. আড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ ও ঘড়বাড়ি সবই জীর্ণশীর্ণ ছিল। ডঃ গৌতম ভদ্রের মতে, দুর্ভিক্ষের কবলে